ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

বাংলাদেশে শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো ঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ আসাদুজ্জামান *

Education and Social Structure of Bangladesh : A Review

Md. Asaduzzaman

Abstract : Education regarded as a driving force for self development of a human being. It helps both male & female to play an active role in the uninterrupted peace of developmental programs of the country (Asaduzzaman, Nasrin Jahan Jinia 2000 : 147). But the concept of Education is not an independent one. It depends on other social factors of the country. It can play its positive role only when the various components of social structure work infavour of it or work together. So, the concept of Education and social structure is interrelated and interdependent one. The modest attempt of this paper is to examine the relationship between the concept of education and social structure and how the quality of education determine by the various components of the social structure in both developed and developing country with special reference to Bangladesh.

শিক্ষিত মানুষ মানেই দক্ষ মানুষ। উচ্চ শিক্ষিত মানুষ মানে অধিক দক্ষ মানুষ। এ দক্ষতার মধ্য দিয়েই মানুষ অর্জন করে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ্য ও লুক্কায়িত শক্তি সম্পদ আহরনের বিপুল ক্ষমতা। যত উচ্চ শিক্ষা মানুষ লাভ করে, ততো তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা বেড়ে চলে। ফলে এক লক্ষ মানুষকে উচচ শিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রাকৃতিক সামাজিক নিয়ম-নীতি আবিস্কার উদ্ভাবনের সামাজিক পটভূমি নির্মান করতে যে টাকা খরচ হয় একজনের একটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারই তার সহস্রগুন বেশী আয় এনে দিতে পারে (খালেকুজ্জামান ঃ ২০০১ : ১৭০)। ১৯২টি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পর্যালোচনা সম্বলিত বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৫ সালের দলিলের উদ্বৃতি দিয়ে অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম লিখেছেন, "বিশ্বের মোট সম্পদের বিভিন্ন ধরনের পুঁজির অবদান হলো ভৌতপুঁজি ১৬ শতাংশ, প্রাকৃতিক পুঁজি ২০ শতাংশ এবং মানব

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ও সামাজিক পুঁজি ৬৪ শতাংশ। অর্থাৎ যে কোন দেশে সম্পদ সৃষ্টিতে মানব ও সামাজিক পুঁজি গঠনের প্রসারমান বিনিয়োগের তেমন কোন বিকল্প নেই। আর এ মানব সম্পদ গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায় না" (শহিদুল ইসলাম : ১৯৯৮)। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষে মানুষে যে সেতুবন্ধন তৈরী হয় তা শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও প্রসারিত হয়। ফলে যথার্থ শিক্ষা ব্যতীত সমাজিক বন্ধন ও সামাজিক ঐক্য, শ্রেণী সচেতনতা এবং, শ্রেণী ঐক্য, জাতীয় ঐক্য কোনটাই যৌক্তিকভাবে বিকশিত হতে পারে না।

শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের বাহক ও ধারক। শিক্ষা সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। সমাজের বিভিন্ন উপাদানের (Elements) মতই শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনন্য উপাদান যা সামাজিক অন্যান্য উপাদানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান যেমন শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে তেমনি শিক্ষাও সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হলো শিক্ষার সাথে সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের যৌক্তিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং কিভাবে এ সম্পর্ক উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের শিক্ষার মান নির্ধারণ করছে সে বিষয়ে আলোকপাত। অধিকন্তু পুরো বিষয়টিকে যৌক্তিকভাবে পর্যালোচনার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ যেমন-শিক্ষা, সমাজ কাঠামো, শিক্ষা ও উন্নয়ন, শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

শিক্ষা (Education)

শিক্ষা মানুষ গড়ার সর্বোত্তম হাতিয়ার। একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন তা দেখেই বুঝা যায় আগামী দিনে দেশটির উন্নয়ন কেমন হবে। চীন দেশর সেই বিখ্যাত প্রবাদটি "তুমি যদি শত বছরের পরিকল্পনা কর, তবে গাছ লাগাও; আর যদি হাজার বছরের পরিকল্পনা করে থাকো, তাহলে মানুষ তৈরী করো।" আক্ষরিক দিক হতে শিক্ষা কথাটির অর্থ বাড়নে সাহায্য করণ,লালন পালন করা, প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি (আসাদুজ্জামান ঃ নাসরীন জাহান জিনিয়া ঃ ২০০০ ১৫৩)।

অধ্যাপক লুৎফুল হক চৌধুরী শিক্ষা ধারণাটির চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উন্নয়ন এবং সমাজ পরিবর্তনের ধারক হিসাবে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে... "Development and social change can best be achieved

by giving prominence to men and human resources rather than things...education and training are considered to be the most effective instruments for modification of the content of men's minds and for reconstituting and developing a society. Education is the master determinant of all aspects of change and development. Education can endow people with knowledge, training, spirit of initiative and social responsibility which will enable them to cope efficiently, imaginatively and creatively with the problems of change and development. Education is the key that unlocks the door to development and modernization." (Chowdhury, Lutful Haq : 1978 : 93).

The world book of Encyclopedia এর মধ্যে শিক্ষাকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে-

"Education is the process by which people acquire knowledge, skills, habits, values and attitudes. ...education is also used to describe the results of the educational process. Education should help them develop on appreciation of their cultural heritage" (The world book of Encyclopedia : Vol. E, p-84).

কেউ কেউ শিক্ষাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন- "Education is the process of increasing knowledge, skill and capacity and creating a positive attitude of the people in a society. In economic terms, it means accumulation of human capital and its effective utilization for development of the economy. Development of human resources enriches the total life itself in its social, cultural and political dimensions (Rahman, Khandaker Mahmudur : 1996 : 499)". Adam Smith তাঁর বিখ্যাত বই The Wealth of Nations-এ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, ... 'fixed capital' includes "the acquired and useful abilities of all the inhabitants or members of the society (quoted from Chowdhury, Lutful Haq : 1978: 96). Alfred Marshal শিক্ষা খাতে ব্যয়কে জাতীয় বিনিয়োগ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, "The most valuable of all capital is that invested in human beings" (Quoted from Chowdhury, Lutful Haq : 1978 : 97)

Swift এর ভাষায়, "education as to maintain and change society at the same time" (Swift : 1970 : 217)

Sukla শিক্ষা প্রত্যয়টিকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, "education generated social change by

a) Changing the values and aspirations of the participants;

b) Changing opportunity structure; and

c) Introducing knowledge and skills of communication" (Sukla : 1963 : 22).

বাংলাদেশের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা ও শিক্ষার গুরুত্বকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ঃ

First Five Year Plan (1973-78)

Education must be responsive to the specific requirements of the nations. It must have relevance to future work and life, and must provide adequate preparation for productive employment. Education must be able to enrich the cultural attainments of the people. (FFYP : 1973)

Second Five Year Plan (1980-85)

Superior input of human efforts is by far the most important determinants of all development. Development of capabilities of man through education and training is crucial to any development effort. The SFYP aims at the development of a low-cost functional education by linking different levels of education with production process as far as possible (SFYP : 1980)

Third Five Year Plan (1985-90)

Education is one of the basic needs for developing human capabilities. The objective of TFYP was to enroll 70% of the primary age-group children by 1990 and to reduce the rural-urban gap in education facilities. it also aims to give emphasis on science, technical and vocational education. (TFYP : 1985)

Fourth Five Year Plan (1990-95)

In any economy, education is a matter of paramount national importance. it is More so in a less developed country like Bangladesh where a comprehensive base of mass literacy, a strong foundation of ethical values conducive to intellectual and material integrity in society, a high quality standard education backed by a dynamic R & D system to promote productivity of labor and management and to enhance the country's resource base on a continuous basis should partially make up the deficiency of capital. Both at individual and national levels, education is an item of consumption, a form of investment and an avenue of employment. The objectives of FFYP was to introduce compulsory primary education, to reduce mass illiteracy, to enlarge and upgrade the base of science education at all levels and to inculcate moral values in society. (FFYP : 1990)

বস্তুত : মানুষকে মানুষ হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীই প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়। এজন্যে তাদেরকে কোন কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না। অথচ মানুষকে জ্ঞান সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য একটি পরিকল্পিত কৃত্রিম কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। প্রকৃত পক্ষে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। জীব জগতের অনান্য শিশুর মত মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়। তার মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন, সমাজ ও পরিবেশ ইত্যাদি তাকে হিতাহিত জ্ঞানের উন্মেষে সাহায্য করে। তাকে মানুষ ও পশুর মধ্যকার পার্থক্যগুলো শেখায়। একমাত্র মানুষই হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংঘবদ্ধ জীব। শিক্ষাই মানুষকে ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য শেখায়। প্রত্যেক মানুষই তিনটি সত্ত্বার সমন্বয়। দেহ, মন ও আত্মা এ তিনটি সত্ত্বার সমন্বয়ে একজন মানুষের অস্তিত্ব। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত ও অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশঘটে। নানা সামাজিক প্রক্রিয়ায় তার মন বেড়ে উঠে। আর আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে নৈতিকতার পরিগঠনের উপর। মহাকবি মিল্টন বলেন- "Education is the harmonious development of body, mind and soul" অর্থাৎ দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই শিক্ষা।

শিক্ষা ও উন্নয়ন

শিক্ষা যেহেতু এক ধরনের পুঁজি, তাই এর সুষম বন্টন সামাজিক কল্যাণ বাড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষা শুধু যে উৎপাদনমুখী এক বিনিয়োগ তাই নয়, সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ (তিলক ঃ ১৯৮৭ : ৬৮)। শিক্ষা এবং উন্নয়ন উভয়ের মূল লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমাজের কাঙ্খিত পরিবর্তন। ব্যক্তি ও প্রজন্মের মনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যবোধ, মনোভাব ও ব্যবহারের কাঙ্খিত ধারায় নিয়ে যাবার প্রক্রিয়াই শিক্ষণ (দেবিয়ার: ১৯৮১)। উন্নয়ন ভাবনায় ও প্রক্রিয়ায় শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। বি, আই, ডি, এস এর একটি সমীক্ষায় শিক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Education contributes to the empowerment of the poor and thereby enhance their capacity to resist exploitation and achieve their rightful bargains in all economic transaction. Secondly, education can facilitate access to more remunerative employment opportunities. A caveat here, however, is that while primary education is seen to carry a generally empowering function, the specific type of education received beyond the primary level in Bangladesh render any on job application rather difficult. This implies a low correspondence between education and labour productivity. The benefits of secondary education and beyond for poor households come only in the distorted form of individual escapes into white-collar employment rather than through productivity increases in existing wage and self-employment avenues. The low correspondence between secondary education and productivity also means that drop-out from this level become a liability for society...The bulk of the poor are those without any formal schooling....55% of all poor and 60% of the hard-core poor" (Rahman and Hussain : 1992 : 2000).

যদি উন্নয়নকে প্রবৃদ্ধি, সাম্য ও জীবনের মান এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় তাহলেও শিক্ষা উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষের গড়পড়তা আয়ু, শিশু মৃত্যুর হার, স্বাস্থ্য সুবিধের উপর অধিকার এমনতরো সীমিত লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ সীমাবদ্ধ রাখলেও এসব অর্জনে শিক্ষার অবদান খাটো করে দেখার উপায় নেই (রহমান, আতিউর: ১৯৯৪ :

৩৯)। বস্তুতঃ উন্নয়নের এসব লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা আরো সুনির্দিষ্ট কিছু অবদান রাখতে পারে :

১) জনশক্তি চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এ ভূমিকার মাধ্যমেই শিক্ষা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

২) সার্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে আয়ের বৈষম্য দূর করে বেশী সংখ্যক মানুষকে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে শিক্ষা সাহায্য করতে পারে।

৩) শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারে এবং জীবনের মান বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। স্ব-উন্নয়নের প্রতি এক ধরনের গর্ববোধ তৈরী করতে পারে শিক্ষা। শিশুকাল থেকে জীবন চলার নানা সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত রাখা এবং পরিবর্তনশীল এ বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মন ও মানসিকতা তৈরীর ক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে (রহমান, আতিউর : ১৯৯৩ : ৩৯)।

শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যয় দুটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে (যেমন সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন) শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সামাজিক উপাদানগুলোর যৌক্তিক আন্ত: সম্পর্ক এবং ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য।

শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান

কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মানের উপর নির্ভর করে। শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান কেমন তা দেখলেই দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বা উন্নত সে সম্পর্কে বোঝা যায়।

শিক্ষার পরিমাণগত মান

শিক্ষার পরিমাণগত মান বলতে একটা দেশ শিক্ষায় কতটুকু দক্ষতা অর্জন করেছে, কতজন শিক্ষার্থী শিক্ষায় অংশ নিচ্ছে, কতজন ভর্তি হলো, কতজন ঝরে পড়লো, পুনরাবর্তন বা Repeatation কেমন তাকে বোঝায়। যেমন- বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে সর্বমোট Dropout ও output rate (%) ছিল-

Rate (%)	Girls	Boys	Total
Total Drop out	65.9	57.6	60.5
Total output	34.1	42.4	39.5

Source : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS)-1991.

শিক্ষার গুণগত মান

শিক্ষার গুণগত মান বলতে বুঝায়, কোন একটা দেশের শিক্ষার্থীদের ফলাফল যেমন-জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ, অভ্যাস-এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গুণগত দক্ষতা বা মান বিচার করা যায়।

যেমন- বাংলাদেশে 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-এ ১৯৮৮-এ বলা হয়েছে-

"শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখি জনজীবন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা, এবং চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরী করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ন জনশক্তি তৈরী করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়" (বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট : ১৯৮৮)।

কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সকল গুণাবলী সঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে না। যেটুকু দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে তাতে গ্রামের ও শহরের স্কুলের ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার মেয়েদের Dropout rate বেশী বলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা শিক্ষায় অনগ্রসর। ছেলেদের দক্ষতা মেয়েদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী। আবার গরীব বা অনুন্নত দেশে উন্নত দেশের তুলনায় Dropout ও Wastage বেশী হওয়ার কারণে শিক্ষার গুণগত মানও ভাল নয়।

শিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর যেমন-

ক. Inputঃ শ্রেণীকক্ষের অবস্থা : ছাত্র-ছাত্রী খুব কম বা খুব বেশী হলে অসুবিধা হয়।

শিক্ষকের যোগ্যতা : শিক্ষকের যোগ্যতা ভাল হলে শিক্ষার্থীরাও লাভবান হয়।

শিক্ষা উপকরণ: বই, পুস্তক, আসবাবপত্র ইত্যাদির উপর শিক্ষার গুণগত মান

নির্ভর করে। বিদ্যালয়ে অবস্থান কাল-কত সময় ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে অতিবাহিত করছে, যেমন-আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত (I-XII) ১২ বছর।

খ. **Output :** শিক্ষার কতটুকু উন্নয়ন হলো, কতজন ভাল রেজাল্ট করেছে, দক্ষতা কেমন বেড়েছে, Wastage কেমন তা নিয়ে গুণগত মান বিচার করা হয়।

গ. **Outcome :** বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে শিক্ষার্থী সমাজে, অর্থনীতিতে কতটুকু সক্রিয়, কতটুকু দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারছে তা শিক্ষার গুণগত মান। এটা শিক্ষার বাহ্যিক দক্ষতা।

সমাজ কাঠামো

কোন মূল বস্তুর গঠনকারী উপাদান, উপাদনগুলোর বিশেষ সংযোজন বা বিন্যাস এবং সেগুলোর ভূমিকা তথা কার্যকারিতা মিলে ঐ বস্তুর কাঠামো গড়ে উঠে। সমাজ প্রাকৃতিক বস্তুর ন্যায় মূর্ত নয় যে, একে আক্ষরিক অর্থে চোখে দেখা বা স্পর্শ করা যাবে। সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। তবে প্রাকৃতিক বস্তুর ন্যায় সমাজ কাঠামো বলতে সমাজের যে সব উপাদানের দ্বারা সৃষ্টি এবং উপাদানগুলো যেভাবে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কাজ করে তার এক বিশেষ ব্যবস্থাকে বোঝায়। ব্যক্তিকে নিয়েই মানব সমাজ বা সামাজিক গোষ্ঠী। অতএব, সমাজ কাঠামো বলতে আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক বা ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ককে বোঝায়। এ সব সম্পর্ক সমাজের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। তাই মানব সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী এবং প্রতিষ্ঠান নিয়ে। এগুলোর প্রত্যেকটি যখন মিলিত হয়ে স্ব-স্ব ভূমিকা পালনার্থে একটি সু-শৃঙ্খল ব্যবস্থার সৃষ্টি করে তখনই গড়ে উঠে সমাজ কাঠামো। সমাজ বিজ্ঞানে সমাজ যেমন একটি বিমূর্ত অথচ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সমাজ কাঠামোও তেমনি একটি বিমূর্ত অথচ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক প্রত্যয়। সমাজের যেমন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না, সমাজ কাঠামোরও তেমনি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান এবং সমাজ নৃবিজ্ঞানী সমাজ কাঠামোর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু সমাজ কাঠামো সম্পর্কে তাদের মতামতে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা সবাই সমাজ কাঠামো প্রত্যয়টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ঐ প্রত্যয়ের এক একটি বিশেষ দিকের উপর দৃষ্টি নিবন্ধন করেছেন। কোন

সংজ্ঞায় সমাজ কাঠামোর সামগ্রিক রূপ নিয়ে বর্ণনা বিস্তারিত করা হয়নি। সমাজ কাঠামো হচ্ছে সমাজের সাংগঠনিক অখন্ড সত্ত্বা। অথচ তাকে খন্ড খন্ড করে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কোন বিশেষ সংজ্ঞা আবার সব সমাজের বেলায় প্রযোজ্য নয়। নিম্নে আমরা সমাজকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

Bottomore বলেন যে, "অধিকাংশ লেখক মূলতঃ সমাজ কাঠামো বলতে সমাজে ঐ "কাঠামোগত রূপকেই বুঝিয়ে থাকেন" (বাটোমোর টম ঃ ১৯৯২-১২৩)।

সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Maclver এবং Page তাদের Society নামক গ্রন্থে বলেন, "In the analysis of social structure the role of the diverge attitudes and interests of social beings is revealed" (Maciver and page : 1952 :30) । দেখা যায় যে, Maclver এবং Page বস্তুতঃ ভূমিকার উপরই জোর দিচ্ছেন এবং এ ভূমিকা যে ব্যক্তির স্বার্থ ও মনোভাবের সংগে সম্পর্কযুক্ত তারা তা উপেক্ষা করেননি।

Moris Ginsberg সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "Social structure is the complex of the principal groups and institutions which constitute society" (Ginsberg : 1934 : 50)

এখানে তিনি সমাজের প্রধান প্রধান সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের যৌগিক সমন্বয়কে সমাজ কাঠামো বলে আখ্যায়িত করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজ বিজ্ঞানীরা এই সংজ্ঞাটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। Bottomore এটাকে "Most usefull" বলে ব্যাখ্যা করেন। সেন বলেন, সংজ্ঞাটি অধিকতর বাস্তবসম্মত। Ginsberg এর এ সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, সমাজ কাঠামো হলো সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের জটিল রূপ। আর এই দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজ কাঠামোর প্রধান উপাদান।

সমাজ কাঠামোর প্রধান উপাদান

(১) প্রধান প্রধান দল গোষ্ঠী এবং

(২) প্রতিষ্ঠানসমূহ।

(১) প্রধান প্রধান দল/গোষ্ঠী

প্রধান প্রধান দল বা গোষ্ঠী এমন এক জনসমষ্টি যার সদস্যদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আগ্রহ, স্বার্থ, মোটামুটি এক বা অভিন্ন। যেমন-পরিবার।

লক্ষ্য ও প্রকৃতি অনুসারে দলকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-

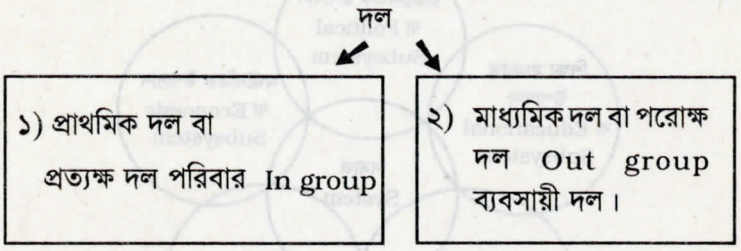

(২) প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝায় এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজ তার কার্য সম্পাদন করে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা সমাজে বিদ্যমান। এ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ হয়। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য এ সকল বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন- (১) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (২) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (৩) সামাজিক প্রতিষ্ঠান (৪) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৫) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও (৬) শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান।

সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান ও শিক্ষা : আন্ত:সম্পর্ক

সামাজিক কাঠামো ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। কোন দেশের শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সামাজিক কাঠামোগত সুসামঞ্জস্যের তাৎপর্য অনেক বেশী। সমাজ মূলতঃ একটা ব্যবস্থা বা System। সমাজের সদস্য হিসেবে এ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি। একটি ব্যবস্থা হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ উপাদান বা Sub-systems নিয়ে সমাজ গঠিত। এ উপাদানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক বিন্যাসই হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আছে সমাজ কাঠামো। সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সমাজের এ সকল প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠান সামাজিক কাঠামোর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন Sub-systems গুলোকে দেখানো হলোঃ

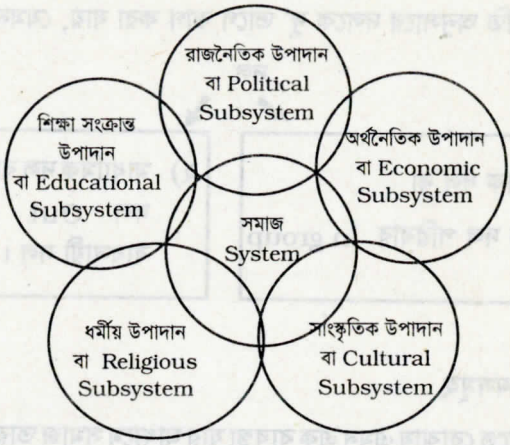

সামাজিক উপ-কাঠামো

সামাজিক কাঠামোর উপদান হিসেবে-রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানে আছে-রাষ্ট্র, সরকার, সংগঠন, নির্বাচন, আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি। অর্থনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানে আছে-সম্পত্তি, অর্থ, উৎপাদন, বিনিয়োগ, বাজার ব্যবস্থা, ভোগ, শিল্পপতি, ভূ-স্বামী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি। ধর্মীয় দল ও প্রতিষ্ঠানে আছে-ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার, অনুশাসন।

শিক্ষা সংক্রান্ত দল ও প্রতিষ্ঠানে আছে-শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, লিখন-শিক্ষা, পরীক্ষা প্রথা, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ইত্যাদি।

সমজের এ সকল দল ও প্রতিষ্ঠান পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের সাথে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। এসব উপাদানগুলো পরস্পর পরস্পরকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যা নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

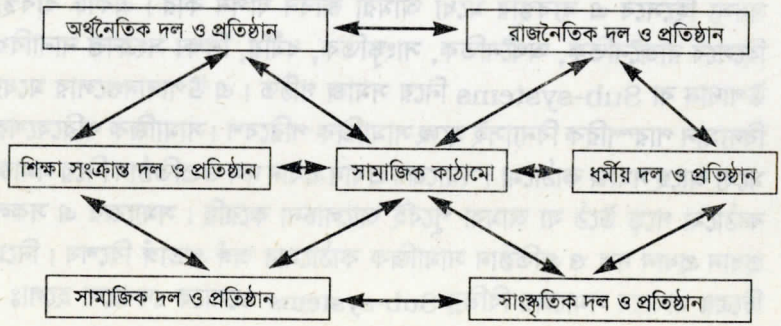

বস্তুতঃ সামাজিক কাঠামোর এ সকল উপাদানের সমাবেশই হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ। এ সকল উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক কাঠামোর গতি-প্রকৃতি গড়ে উঠে (আব্দুল মালেক, ১৯৯৩)।

সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানসমূহের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্ক আলোচনা ঃ

রাজনৈতিক উপাদান ও শিক্ষা

সামাজিক কাঠামোর অন্যতম উপাদান হিসেবে রাজনৈতিক উপাদান সমাজ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের অন্যান্য অংশের ক্রিয়া রাজনৈতিক উপাদানের ক্রিয়া দ্বারা প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয়। এ দিক দিয়ে বলা চলে, সামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক উপাদানের প্রধান দিক হিসেবে রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নির্বাচন, আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির ক্রিয়া একটা দেশের গোটা সামাজিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। একটি রাষ্ট্র কতটুকু গতানুগতিক বা আধুনিক, কতটুকু গণতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক ইত্যাদির উপর সেই রাষ্ট্রের সামাজিক পরিবেশ নির্ভর করে। সরকারও রাষ্ট্র যদি যৌক্তিক ক্রিয়ার অধিকারী না হয় তবে সে দেশের সংবিধান,নির্বাচন, আমলাতন্ত্র ইত্যাদিও যৌক্তিক চরিত্রের অধিকারী হয় না।

একটা দেশের শিক্ষার ফলাফল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও দেশের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষার উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য আছে। রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উপর শিক্ষার ভিত্তি নির্ভর করে। রাজনৈতিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য অন্যান্য উপাদানের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পৃথিবীতে আমরা কয়েক ধরনের রাষ্ট্র দেখতে পাই। যেমন-

১. উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র
২. উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র
৩. স্বল্পোন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
৪. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
৫. রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

সাধারণত ঃ আমরা উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক দেখতে পাই। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের উন্নত রাজনৈতিক অবস্থা শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক। কিন্তু স্বল্পোন্নত ও রাজতান্ত্রিক দেশের অযৌক্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন-উন্নত দেশের রাষ্ট্রে স্বচ্ছ জবাবদিহিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা রয়েছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কম, সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত, সংবিধান প্রণয়নে জনগণের স্বার্থ রক্ষা, সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'য়া, বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ নেই, আমলাতন্ত্র যৌক্তিক ও সেবাধর্মী ফলে এ সব দেশের শিক্ষার হার অনেক বেশী। উন্নয়নশীল দেশে স্বচ্ছ জবাবদিহিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা তুলনামূলকভাবে কম, প্রায় সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে শিক্ষার হার আশানুরূপ নয়। আবার স্বল্পোন্নত দেশসমূহে জবাবদিহিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা অনেক কম, তত্ত্বগতভাবে জনগণের স্বার্থের কথা থাকলেও বাস্তবে এর অনুশীলন নেই, ব্যক্তিস্বার্থে সংবিধান পরিচালিত হয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়না, বিচার ব্যবস্থায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থাপনা দেখা দেয়, আমলাতন্ত্র অযৌক্তিক, দুর্নীতি, কেন্দ্রীকতা, ধীরগতি সম্পন্ন, সেবাধর্মী নয় ফলে এসব দেশে শিক্ষার হার কম।

অর্থনৈতিক উপাদান ও শিক্ষা

কোন দেশের শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপাদানের ভূমিকার ন্যায় অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বলা চলে কোন দেশের শিক্ষার বাস্তব শর্তই নিহিত থাকে সে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। একথা সত্য যে, গতিশীল ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনা। একথাও সত্য যে, গতিশীল ও শক্তিশীল অর্থনৈতিক ভিত্তি ছাড়া আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে না। অর্থনীতিবিদের মতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শিক্ষার সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশী হলে স্বাক্ষরতার হারও বেশী হয়।

চিরায়ত অর্থনীতিবিদ যেমন এডামস্মিথ, রিকার্ডো, মার্শাল, ফিশার যাদের তত্ত্ব দীর্ঘদিন ধরে মৌলিকতত্ত্ব হিসেবে চলে আসছে তাঁরা সবাই শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ইতিবাচক সম্পর্ক আছে তার উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁদের মতে "শিক্ষা এমন একটি ক্ষেত্র যার লক্ষ্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে পুঁজির সঞ্চায়ন ঘটানো।" শিক্ষা মানব পুঁজির প্রসার ঘটিয়ে বস্তুগত ও

অবস্তুগত পুঁজির সঞ্চায়ন ঘটায়। আধুনিক কালের অর্থনীতিবিদ যেমন-থিওডর শুলজ, জন ডেইজী, আর্থার লিউইস, রিচার্ড হারবিসন, জন ইয়ারর্স, জিন বোম্যান, আরনল্ড এন্ডারসন, প্রিসলী-প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ গবেষণার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করেছেন যে, "শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত অর্থ ও সম্পদের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে জাতীয় অর্থনীতি বিশেষভাবে লাভবান হয়"। তারা শিক্ষার সাথে অর্থনীতির যে ইতিবাচক সম্পর্ক আছে গবেষণার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। সবাই একমত যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে যত সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় জাতীয় অর্থনীতিও তত বেশী লাভবান হয়।

এ সকল গবেষণার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা খাতে ৭% বিনিয়োগ করার জন্য UNESCO সুপারিশ করে। অথচ বাংলাদেশে শিক্ষা খাতেমাত্র ২% বিনিয়োগ করা হয়।

শিক্ষা সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে শিক্ষা প্রসারের জন্য শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি দরকার। শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে না যদি অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় না হয়। "অর্থনৈতিক চক্র যত বেশী জোরদার হবে তত বেশী মানব পুঁজী দরকার হবে, তত শিক্ষার চাহিদা ও মান বাড়বে। উন্নত দেশে এই অর্থনৈতিক চক্র দ্রুত ঘুরছেস্বস্ব (মালেক আব্দুল ঃ ১৯৯৩)

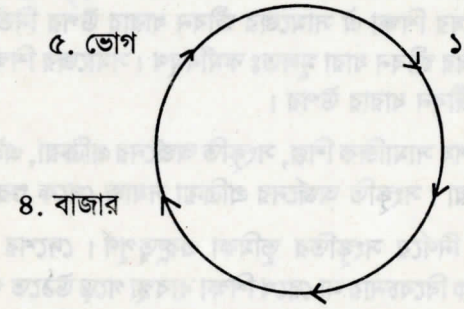

পুঁজি অর্থনীতির মূল বিষয়। পুঁজি বিনিয়োগ যত বেশী হবে উৎপাদন তত বাড়বে ফলে সেটা আন্তর্জাতিক বাজারে অংশ নেবে। পণ্যের বাজার দর বাড়লে-ভোগও বাড়বে-সেটা আবার পুঁজিতে যাবে। যে দেশের এই চক্রটি যত বেশী ঘোরে সেখানে অর্থনৈতিক ভিত্তি তত জোরদার হয়। দেশের অর্থনৈতিক চক্রের গতি যতদ্রুত হয় তত তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গতানুগতিকতা পরিহার করে

আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যায়। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ। এ পরিস্থিতিতে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটে সমাজের অভ্যন্তরীণ টানেই। সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এ অবস্থা "Pull factor" হিসেবে কাজ করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে দ্রুত শিক্ষার বিকাশ ঘটে।

উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার প্রসার মূলতঃ এই প্রক্রিয়াতে হয়েছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক চক্রটি মন্থর গতির হলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গতানুগতিকতা পরিহার করতে পারে না। ফলে দেশে গতানুগতিক পেশার আধিক্য থাকে। এ অবস্থায় সমাজে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা অনুভূত হয় না। এতে সমাজের অভ্যন্তর থেকে শিক্ষার প্রসারের চাহিদা আসেনা। শিক্ষাকে বাইরে থেকে ধাক্কা দিলে তা প্রসারের প্রয়োজন ঘটে। শিক্ষা বিস্তারের এই অবস্থাকে 'Push factor' বলা হয়। বাংলাদেশের মত অধিকাংশ অনুন্নত দেশে শিক্ষা বিস্তারে এই Push factor কাজ করে।

সাংস্কৃতিক উপদান ও শিক্ষা

সংস্কৃতির সাথে শিক্ষার একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় জীবনধারা। প্রত্যেক মানুষ কোন কোন ভাবে সংস্কৃতির অধিকারী। মানুষের জীবন ধারার সাথে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। একটি সমাজের মানুষের শিক্ষা ঐ সামজের জীবন ধারার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে মানুষের জীবন ধারা মূলতঃ কর্মবিমুখ। সমাজের শিক্ষা কেমন হবে তা নির্ভর করে জীবন ধারার উপর।

সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ সামাজিক শিল্প, সংস্কৃতি অর্জনের প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়া হচ্ছে সামাজিক প্রক্রিয়া। সংস্কৃতি অর্জনের প্রক্রিয়া সমাজ থেকে শুরু হয়।

শিক্ষার গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিবেচনায় না রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। সাংস্কৃতিক উপাদান কোন কোন দেশে শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যেমন-উন্নত দেশসমূহে। আবার কোন কোন দেশে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ কের যেমন-আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশসমূহে। এরই ফলশ্রুতিতে শিক্ষার গুণগত ও পারিমাণগত মান সামগ্রিকভাবে ব্যহত হয়।

ধর্মীয় উপাদান ও শিক্ষা

সমাজ কাঠামো তথা সামাজিক পরিবেশে ধর্মীয় উপাদানের সাথেও শিক্ষার

সম্পর্ক নিবিড়। সমাজে মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মীয় আচার রীতি ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি শিক্ষার উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় উপাদান যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন না করে তবে সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজকের উন্নত দেশগুলোতে ধর্মের ক্ষেত্রে একটি সৌহার্য্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম এসব দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামীর পরিবর্তে উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফলে এসব দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাও বিকশিত হচ্ছে অবিরত ধারায়। অন্যদিকে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশে ধর্ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ও গোঁড়ামীর ভূমিকা পালন করে চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এর ফলে এসব দেশের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শিক্ষার বিকাশ ততখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেনা। বিভিন্ন ধর্মীয় ইস্যুতে সমাজে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কারণে শিক্ষাঙ্গনেও স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

সামাজিক উপাদান-পরিবার ও শিক্ষা

সামাজিক কাঠামোর বিশেষ উপাদান হিসেবে পরিবার তথা গোটা সামাজিক পরিবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারকে সমাজের মৌলিক একক বলা হয়। সমাজের মৌলিক একক হিসেবে পরিবার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে সমাজের অধিকাংশ পরিবার প্রধান তাদের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়, সেখানে শিক্ষার প্রসার তেমনভাবে ঘটেনা। অন্যদিকে যে সমাজে পরিবার এ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়, সেখানে শিক্ষার প্রসার ঘটে দ্রুত।

শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার সামজের মৌলিক একক হিসেবে তিনটি প্রধান কাজ সম্পন্ন করেঃ

১. শিক্ষার প্রতি শিশুকে উৎসাহিত করাঃ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, এ ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবার আগে, বিদ্যালয় পরে। শিশুকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ পরিবারগুলোকে সৃষ্টি করতে হবে।

২. শিশুর শিক্ষার পরিকল্পনা করাঃ শিশুকে কে শিক্ষা দিবে? কোন ধরনের শিক্ষা দিবে? সেটা পরিবারকেই পরিকল্পনা বা নির্ধারণ করতে হবে।

৩. শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থাপনা করাঃ এর কতগুলি দিক আছে, যেমন শিশু

শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়–

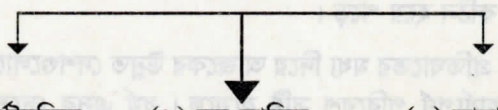

১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারের যথাযথ অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনের সাথে পরিবার প্রধানের অর্থনৈতিক বিষয়টা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে শিশুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পরিবারকেই করতে হয়।

২. মনঃস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনাঃ শিশুর পছন্দ অপছন্দ হিসেবে তাকে স্কুলে দেওয়া হচ্ছে মনঃস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা। ঘরে ও বাইরে তার মনস্তত্ত্ব বুঝে তাকে স্কুলে দেওয়া উচিত।

৩. সামাজিক ব্যবস্থাপনা ঃ পারিবারিক পরিবেশে শিশুর শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থাপনা।

যে সকল পরিবার এসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে সে সব পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও ব্যহত হচ্ছে। যত বেশী সংখ্যক পরিবারকে এই ভূমিকায় আনা যাবে শিক্ষার মান তত বাড়বে। উন্নত দেশে পরিবার এ সব ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। এ ভূমিকা তারা অনেক আগে থেকে পালন করে আসছে বিধায় তাদের শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান বাড়ছে।

শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান নির্ভর করে সমাজের বিভিন্ন উপাদানের ইতিবাচক কার্যকারণ সম্পর্কের উপর। এ উপাদানগুলোর মধ্যে উলম্ব ও সমান্তরাল কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। একটি দেশের সার্বিক বিকাশ এগুলোর সাথে জড়িত। কোন দেশ শুধু শিক্ষায় উন্নত হলেই সে দেশ উন্নত হবে না, তার মধ্যে রাজনৈতিক , সামাজিক, সাংস্কৃতি, ধর্মীয় উপাদানের উন্নতি থাকতে হবে। যেমন-শ্রীলংকায়, শিক্ষার হার অনেক বেশী হলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উন্নত হতে পারছে না। তেমনি কোন দেশ যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হলেও তাদের উন্নতবলা হয় না। কারণ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা আছে। সমস্ত উপাদানের উলম্ব ও সমান্তরাল ধারার

ক্রিয়ার উপর শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত বিষয় জড়িত। সেটা যৌক্তিক না অযৌক্তিক তা দেখতে হবে। যদি যৌক্তিক সম্পর্ক থাকে তবে শিক্ষা ব্যবস্থাও উন্নত হবে।

বিভিন্ন দেশের উদাহরণ

উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ

কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি। এ সকল দেশে রাজনৈতিক উপাদানের মধ্যে যৌক্তিক ক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও যৌক্তিকতা বিরাজ করছে। তারই ফলশ্রুতিতে শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানের বিকাশ ঘটেছে ইতিবাচক ধারায়। এ সকল দেশের কোনটিতে স্বাক্ষরতার হার ১০০% বা এর কাছাকাছি। এসব দেশের রাষ্ট্র জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ, প্রতিষ্ঠানগত স্বাধীনতা বিদ্যমান, সরকারের ব্যবস্থা সেবাধর্মী, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার, সংবিধানে জনগণের স্বার্থরক্ষা হয়। সংবিধান পরিবর্তন হয় স্বাভাবিক ধারায়। অথবা নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, বিচার ব্যবস্থাও স্বাধীন, আমলাতন্ত্র যৌক্তিক ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও কম। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও অনেক বেশী, তাদরে মাথাপিছু আয়ও অনেক বেশী। উন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক চক্রের গতি দ্রুত, ফলে শিক্ষা 'Pull factor' হিসেবে কাজ করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত হলেই মাথাপিছু আয় বাড়ে ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে এই সকল দেশ উপরে থাকে। বর্তমানে কানাডা এদিক দিয়ে সর্বোচ্চে অবস্থান করছে। ১৭৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪৬তম, এসব দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিও দৃঢ় (UNDP : ১৯৯৫)।

উন্নত দেশগুলোর মানুষের জীবন ধারা তথা সাংস্কৃতিক ভিত্তির মধ্যে নিহিত আছে শিক্ষা প্রসারের চাহিদা। তাদের শিক্ষার প্রসার ঘটছে স্বতঃস্ফুর্ত গতিতে এবং তাদের প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করছে।

এ সকল দেশ ধর্ম রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামীর পরিবর্তে উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষারও গুণগত ও পরিমাণগত মান বাড়ছে।

কানাডার লোকসংখ্যা ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত খুব কম বেড়েছে। ৪০ বৎসরে বেড়েছে মাত্র ১৩ লক্ষের মত। এদেশে মাথাপিছু আয়ও অনেক বেশী। ১৯৮৮-৯৩ পর্যন্ত মাথা পিছু আয় ছিল ১৯,৯৭০ ইউ এস ডলার। তাই তাদের শিক্ষার হারও অনেক বেশী। প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রছাত্রী ১০০% ভর্তি হয়। সেখানে মেয়েদের শিক্ষার হারও অনেক বেশী। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ১.২, যা ১৯৭০-৭৫ সালেও ছিল ১.৭ (Hunter : 1994 : 95)। ২০ বছরে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বাড়েনি। তাদের নির্ভরশীল জনসংখ্যার হারও অনেক কম। এদেশের উন্নতির মূলে আছে সমাজ কাঠামোর সকল উপাদানসমূহের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক যা শিক্ষাকে প্রভাবিত করছে উন্নয়নের মূল ধারায়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহ

মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দঃ কোরিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ।

উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভের পর উন্নত দেশের অনুকরণ করে নিজস্ব সাহায্যে উন্নত হওয়ার চেষ্টা করে এবং কিছুটা সফলও হয়েছে। এ সকল দেশ বর্তমানে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আছে এবং দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি বাড়ার সাথে সাথে শিক্ষারও বিস্তার ঘটছে।

মালয়েশিয়া একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির জনসংখ্যা ১৯৮৮-৯৩ এর হিসেব অনুযায়ী ১৯.০৩ মিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অনেক কম মাত্র ১.৪। তাদের মাথাপিছু আয় ১৯৮৮-৯৩ সালে ছিল ২১৪০ ইউ এস ডলার। কিন্তু ১৯৭০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৮৯০ ডলাল। মালয়েশিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। যেহেতু সমাজ কাঠামোর সকল উপাদানের পরিচালন ভূমিকায় আছে রাজনৈতিক উপাদান। তাই এদেশ অন্যান্য সকল পর্যায়ের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন

প্রাথমিক স্কুলে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৯৮৮-৯৩ সালে ৯৩% তেমনি মাধ্যমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ ৫৮% (A world bank report : 1995) । এ ধারা চলতে থাকলে অচিরেই তারা পৃথিবীর উন্নত দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। তাদের সঠিক পরিকল্পনা অন্যান্য উপাদানের সাথে শিক্ষাকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার অভিজ্ঞতার কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। স্পষ্টত:ই ঐ দেশের উন্নয়নের সাফল্য মূলত: কোরীয় জনগণেরই সাফল্য। শিক্ষার প্রতি কোরীয় জনগণের আগ্রহ ও আবেগের সাফল্য। শিক্ষার উঁচু হার, কাজের প্রতি আগ্রহ, প্রশিক্ষণের সুযোগ ইত্যাদি কারণেই সেদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এমন উঁচু হারে ধরে রাখা গেছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা- "Their relatively high level of education, motivation, trainability, and ability to work together have been noted as characteristics conducive to development. Of these characteristics there high level of education is considered to be attained and cultivated through the educational process" (Choo in Lee and Yamanzawa : 1990 : 171)

এ সকল উন্নয়নশীল দেশে সঠিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় উপাদানের সুসামঞ্জস্যের ফলে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানও সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহ

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল প্রভৃতি দেশসমূহ।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুকরণ করা হয় সর্বক্ষেত্রে। ফলে এসকল দেশে তত্ত্বগত ভিত্তি আছে কিন্তু বাস্তবে এর কোন অনুশীলন হচ্ছে না। দেশ দরিদ্রতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং এসব দেশে দারিদ্রের দুষ্টচক্র মানুষের জীবনকে পরিচালিত করছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকলেও বাস্তবে কোন কিছুই গণতান্ত্রিকভাবে হচ্ছে না। রাজনৈতিক জবাবদিহিতা কোন ক্ষেত্রেই দেখা

যায় না। প্রতিষ্ঠানগত কোন স্বাধীনতা নেই। প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, বেশী ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত। এখানে অর্পিত গুণ বেশী কার্যকরী হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে দেখা যায় যে, কয়েকটি পরিবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় বার বার ঘুরে আসছে। রাজনৈতিক দলগুলো কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসে না। সংবিধানে জনগণের স্বার্থরক্ষার কথা বলা হলেও ক্ষমতার অধিকারী দল তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে সংবিধান পরিবর্তন করছে। নির্বাচনও এখানে সুষ্ঠুভাবে হয় না। আমলাতন্ত্র অধিক মাত্রায় অযৌক্তিক, কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী এবং আমলারা রাজনৈতিক নেতাদের পরিচালিত করে।

এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক দলের আধিক্য দেখা যায়। এমন রাজনৈতিক অবস্থায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও অনেক কম। অর্থনৈতিক চক্রটি এসব দেশে অনেক ধীরে ঘুরছে ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা স্বত:স্ফূর্তভাবে না এসে Push factor হিসেবে আসছে। এ কারণেই এসব দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে সন্ত্রাস, মারামারি, হানাহানি ফলে শিক্ষার বিকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটছে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্রটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, এ দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত বলা যায়। এসকল দেশের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কেন এখনও স্বল্পোন্নত পর্যায়ে আছে। যেমন-বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২.৭ কোটি, আয়তন অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনত্বপূর্ণ এ দেশ। মাথাপিছু আয় মাত্র ২৩৫ ইউ, এস ডলার। বার্ষিক রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ২.৫ বিলিয়ন, ইউ, এস, ডলার। কিন্তু বৈদেশিক দেনা অনেক বেশী ১৪.৮ মিলিয়ন ইউ, এস, ড়লার (দৈনিক সংবাদ, ৪ঠা ডিসেম্বব ১৯৯৫)। এ চিত্র নিয়ে একটি দেশ কখনই উন্নতির দিকে এগুতে পারে না। তেমনি ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপালের অবস্থাও একই রকম। সর্বক্ষেত্রে এ নাজুক পরিস্থিতি দেশের সবকিছুকে দারিদ্রের পর্যায়ে রাখছে। তেমনিভাবে এসব দেশের শিক্ষার হারও অনেক কম। কিন্তু শ্রীলংকায় শিক্ষার হার বেশী সত্ত্বেও এদেশটি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে স্বল্পোন্নত পর্যায়ে আছে। কারণ শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হলে অন্যান্য সকল পর্যায়ের স্বাভাবিক বিস্তার ঘটাতে হবে। কারণ শিক্ষা সমাজের সকল দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো-

দেশের নাম	জনসংখ্যা (কোটিতে)	জিডিপি বৃদ্ধির হার (%)	মাথাপিছু আয় (ডলারে)	সঞ্চয়ের হার (জিডিপি'র)	বার্ষিক রপ্তানী (মিলিয়ন ডলার)	বৈদেশকি দেনা (মিলিয়ন ডলার)
বাংলাদেশ	১২.০৭	৪.৫৫	২৩৫	৭	২.৫	১৪.৮
ভারত	৯০.৭১	৪.২	৩১০	২৪	২৩.৫	৭৭.০
পাকিস্তান	১২.৬৪	৪.০	৪৪০	১৪	৭.৯	১৮.৪
শ্রীলংকা	১.৭৮	৬.৯	৫৫০	১৬	৩.০	৬.৪
নেপাল	২.১৩	২.৯	১৮০	১০	০.৪	১.৯
ভূটান	০.৬	৫.০	৪১৫	১৭	০.১	০.১
মালদ্বীপ	০.২	৬.১	৪৭০	৪৫	০.১	১.১

Source- দৈনিক সংবাদ,৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৫

বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো তিনটি স্তরে বিভক্তঃ

১. প্রাথমিক স্তর

২. মাধ্যমিক স্তর

৩. উচ্চ শিক্ষা স্তর।

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর কোন স্তরেই শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান অনেক নীচে। অধ্যাপক শামসুল হক মন্তব্য করেছেন যে, "আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ কোন স্তরেই নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না" (মালেক আব্দুলঃ ১৯৯০)। বাংলাদেশের শিক্ষার পরিমাণগত মানের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫ বছরে উপরের বয়সী জনসংখ্যার শতকরা ৭৫.৭ ভাগ নিরক্ষর। ১৯৫১ সালের এ হার ছির ৮১.৯ ভাগ। ১৯৯১ সালের হিসেবে এ হার ৭৫.২৮ ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হারের তেমন উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ) এর হিসেব অনুযায়ী (১৯৮৮ সালের) বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী (৬-১০ বছর) শিশুর সংখ্যা ১

কোটি ৪ লক্ষ ৭০ হাজার। এদের থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় শতকরা ৬০ভাগ। পঞ্চম শ্রেণী শিক্ষা সমাপ্ত করে তাদের শতকরা ২০ ভাগ এবং ঝরে পড়ে ৮০ ভাগ (BANBEIS : 1988)। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পরিমাণগত মান অতি নিম্ন এবং পাশাপশি গুণগতমানও অনেক নিম্ন। প্রাথমিক স্তরে মাত্র ২৫% শিক্ষার্থী শিক্ষালাভে অংশ নেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষার গুণগত মান খুব খারাপ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা তাদের মৌলিক জ্ঞান সমাজে কাজে লাগাতে পারছে না। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে যেখানে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ সৃষ্টির উৎস হিসেবে কাজ করার কথা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা বহুলাংশে ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। ইউনেস্কোর মতে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য সার্টিফিকেট দেয়া, শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ করা নয়।

বাংলাদেশের শিক্ষার মান নিম্ন হওয়ার কারণসমূহ

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাণগত সংকট বা পরিমাণগত মান ও গুণগত মান উভয়ই নিম্ন। এ পর্যায়ে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীই তাদের আগ্রহের বিষয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়ে সাধারণ শিক্ষা লাভ করতে হয়। সামগ্রিক বিচারে বলা চলে যে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী যেহেতু তাদের পছন্দের কার্যক্রম এবং বিষয় অনুযায়ী অধ্যয়ন করতে পারে না, সেহেতু এ ক্ষেত্রে তাদের মেধার অপচয় নিঃসন্দেহে ঘটে থাকে। সম্পদের অপচয়ও ঘটে থাকে।

বাংলাদেশে শিক্ষার এই পরিমাণগত ও গুণগত মান নিম্ন হওয়ার কারণ শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাই নয়, সার্বিকভাবে সমাজ কাঠামোর প্রত্যেকটি উপাদান সমানভাবে দায়ী। বিভিন্ন উপাদানের সাথে শিক্ষার অযৌক্তিক সম্পর্কের ফলে এখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটেনি।

রাজনৈতিক কারণ

বাংলাদেশে শিক্ষা সংকটের বা পরিমাণগত ও গুণগত মান নিম্ন হওয়ার মূলে বিদ্যমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় কারণগুলোর পেছনে মৌলিক কারণ হিসাবে দায়ী করা যায় এদেশে বিদ্যমান দীর্ঘ দিনের স্বৈরতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক রাজনৈতিক ধারা। এই ধরনের রাজনৈতিক ধারার কবলে পড়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলোর

যৌক্তিক বিকাশ ঘটতে পারেনি। এর নেতিবাচক ফলাফল সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারকে প্রভাবিত করেছে। এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া এবং সময়ের ব্যবধানে তা অনেক দূর প্রসার লাভ করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠির স্বার্থে ব্যবহার করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাভাবিক বিকাশের ধারা ব্যহত করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিকৃত ধারা শুরু হয়েছে। বস্তুত এ ধরনের অযৌক্তিক রাজনৈতিক ধারা সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ পরিবারকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা আত্মিকভাবে অসমর্থ করে তুলছে।

অর্থনৈতিক কারণ

বস্তুত বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হারের শ্লথ গতির মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক চক্রের মন্থর গতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক গুণগত পরিবর্তন ছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিগত বছরগুলোতে নানা প্রকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরই প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সর্বজনীন শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য থেকে আমরা অনেক দূরে রয়েছি। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনপোযোগী ২০% ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। যারা ভর্তি হয় পঞ্চম শ্রেণী পাশের আগে তাদের ৬০% ঝরে পড়ে। ১৯৯১ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কতখানি অর্জিত হবে তা বলা যায় না। এ সবের মূলে আছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি।

বাংলাদেশে অধিকাংশ অভিভাবক গতানুগতিক পেশার সাথে জড়িত। যে পেশা গ্রহণ করলে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়না সেটাই গতানুগতিক পেশা বা প্রাথমিক সেক্টর। মাধ্যমিক সেক্টর ও তৃতীয় সেক্টর বা সেবামূলক কাজে খুব কম লোক জড়িত। আধুনিক পেশা গ্রহণ করতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে ৮২% পরিবার গতানুগতিক পেশার সাথে জড়িত। যেহেতু ৮২% লোক গতানুগতিক পেশার সাথে জড়িত তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না এবং বেশীর ভাগ মানুষকে শিক্ষায় টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে

না। ফলে Push factor হিসেবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

অভিভাবকের নিম্ন আয়ঃ শিক্ষার ব্যয়কে প্রধানত দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে- যেমনঃ

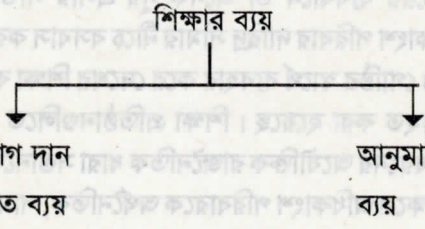

শিক্ষায় সুযোগ দান জনিত খরচ হলো লেখাপড়ায় যে সময়টা শিশুরা ব্যয় করছে তার একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে। সে সময়টা বাইরে কাজ করলে সে তার মূল্য পেত। যে সকল পরিবার এ খরচ মেটাতে পারে তারাই বাচ্চাদের স্কুলে পাঠায়। আনুমানিক খরচ হলো লেখপড়ার সাথে জড়িত বই, খাতা, জামা ইত্যাদি সংক্রান্ত খরচ। UNDP রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের ৮০% লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। ৪০% লোক দারিদ্রের মধ্যে বাস করে। তাদের পারিবারিক আয় অনেক কম। UNDP রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের পারিবারিক আয় ১ ডলারের কম। অভিভাবকরা এই খরচ বহন করতে পারছেনা। ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ করে গ্রামীন সমাজে যে সকল গতানুগতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান, প্রথা ও মূল্যবোধ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলির ধারক ও বাহক হিসাবে পরিবারগুলি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামীন সমাজে শিক্ষার মান নিম্ন হওয়ার এটিও একটি কারণ। এক্ষেত্রে যে সকল বিষয় শিক্ষা প্রসারের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে সেগুলি হলো বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পর্দা প্রথা সম্পর্কে ভূল ধারনা ইত্যাদি।

বাল্য বিবাহ ঃ প্রথমত বাল্য বিবাহ দ্বারা অল্প বয়সেই অনেক বালক ও বালিকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে। দ্বিতীয়ত- এ সকল দম্পতি তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে পরিপক্কতা আসার আগেই সন্তান জন্মদান করতে শুরু করে।

বস্তুত শিক্ষা ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহের এ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলি দুষ্ট চক্রের ন্যায় ক্রমাগত প্রজন্মের পর প্রজন্ম আবর্তিত হয়ে আসছে।

বহু বিবাহ ঃ বহু বিবাহ ভিত্তিক পরিবারগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে না। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার নিম্ন হওয়ার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত সমস্যা বেশ প্রকট রূপ ধারণ করেছে। সমাজে নারী পুরুষের মর্যাদায় পার্থক্য থাকায় বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত সমস্যার প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত হচ্ছে নারীরা। এসব দুঃস্থ নারীদের ছেলে-মেয়েরা আদৌ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়না। এটি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই বহুলাংশে সত্য।

পর্দা প্রথা ঃ বাংলাদেশের সমাজে পর্দা প্রথা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনার অভাব দেশের নারী শিশুর উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে পর্দা প্রথা নেতিবাচক প্রভাব না ফেললেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ও মহিলা শিক্ষিকার অপ্রতুলতা দুটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক ধর্মীয় কারণ

বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবারে বিরাজমান বিশেষ সামাজিক ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গি ও রীতিনীতির কারণেও শিক্ষা সংকট বিশেষ করে নারী শিক্ষায় সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ গ্রামীন সমাজে এর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক ধর্মীয় কুসংস্কার জনিত কারণে অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবক নিয়তির উপর নির্ভরশীল। নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত ও সকল অভিভাবক বিজ্ঞান মনস্ক ও ইহজাগতিক চেতনা সম্পন্ন নয়। এ অবস্থায় তারা তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়টি নিয়তির উপর ছেড়ে দিয়ে থাকেন। এর ফলাফল হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই গতানুগতিকতার প্রভাবমুক্ত হতে পারছে না। হতে পারছে না জাগতিক চেতনা ও প্রাধান্য সম্পন্ন একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রাজ্যে পৃথিবীতে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা আত্মস্থ করার মত সামাজিক মানসিকতা বা আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে না বাংলাদেশে। এর ফলে বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মানের বিকাশও ব্যহত হচ্ছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত কারণ

"Education builds education" অভিভাবকরা শিক্ষিত হলে সন্তানরাও শিক্ষিত হয়। আমাদের মত দেশে স্বাক্ষরতার হার বাড়ছে না কারণ অভিভাবকরা নিরক্ষর। এজন্য Push factor হিসেবে বয়স্ক মানুষের উপর শিক্ষা প্রয়োগ করা হলে তারা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া শিখাবে। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব প্রাতিষ্ঠানিক। কিন্তু সমাজের মৌলিক একক পরিবার। বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। এটা না হলে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়।

সবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী নয়। অন্যান্য সামাজিক উপাদানও অনেকাংশে দায়ী। শিক্ষার সাথে অন্যান্য উপাদানের সম্পর্ক ইতিবাচক না হওয়ায় যৌক্তিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি। সামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানের মধ্যে বিদ্যমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শিক্ষার গতি প্রকৃতির উপর অযৌক্তিক প্রভাব ফেলছে।

পর্যালোচনা

উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সামাজিক কাঠামো ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার ফলে উন্নত দেশগুলিতে গত কয়েক বছরে অন্যান্য উপাদানের উন্নতির সাথে সাথে শিক্ষার হারও বেড়েছে। যেমন-কানাডার ১৯৭০ সালে G.N.P ছিল ৭৭১০ US$ এবং ১৯৯৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৯৯৭০ US$, এর সাথে সাথে প্রাইমারী স্কুলে অংশগ্রহণের হারও বেড়েছে এবং স্বাক্ষরতার হারও অনেক বেশী।

আবার উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এর ফল স্বরূপ শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাদের স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে। যেমন-মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দঃ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশ যেমন-বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এ দেশগুলি প্রধানত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অন্যান্য উপাদানের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে শিক্ষার হারও তেমন বাড়েনি। এর ফলে এ দেশগুলি দরিদ্রতার দুষ্ট চক্রের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

উন্নত দেশে স্বাক্ষরতার হার বেশী বলে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কম। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে স্থূল জন্মের হার কমে আসে ফলে স্থূল মৃত্যুহারও কমে, এর সাথে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কমে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে আসে (হক মোঃ নাজমুল ঃ ১৯৮৪)। যেমন নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে স্বাক্ষরতার হার ও প্রজনন হারের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

দেশ	১৫+ বয়সের স্বাক্ষরতার হার	প্রজনন হার
সুইডেন	১০০	১.৯
যুক্তরাষ্ট	৯৯	১.৮
হংকং	৮৮	১.৪
শ্রীলংকা	৮৭	২.৬
ইন্দোনেশিয়া	৭২	৩.৩
ভারত	৪৪	৪.২
বাংলাদেশ	৩২	৫.৩
নেপাল	২২	১২.৬
জাম্বিয়া	২০	৬.৩
সিয়েরলিউন	১৩	১৬.৫

Source : UNDP, Huamn Development Report-1991

আবার স্বাক্ষরতার হার বাড়লেও জনগণের মধ্যে সচেতনতা আসে বিশেষ করে নারী শিক্ষা বাড়ার সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমবে। উন্নয়নশীল দেশ যেমন-কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, হংকং এসব দেশে সঠিক সামাজিক কাঠামোগত উপাদানের যৌক্তিক সম্পর্কের কারণে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন GDP বৃদ্ধির হার বেশী কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে যেমন-ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তানে অনেক কম (কাদের এম, এ, ১৯৯৩)।

নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের GDP বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো ঃ

রাষ্ট্র	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১
কোরিয়া	১১.৩	৭.৩	৭.১	৭.০
তাইওয়ান	৭.১	৭.৪	৬.৬	৭.৬
হংকং	৭.৩	৭.৪	৪.১	৪.০
সিঙ্গাপুর	১১.০	৯.৪	৯.৯	৭.২
মালয়েশিয়া	৮.১	৮.০	৬.৫	৪.৯
ইন্দোনেশিয়া	৫.৭	৮.০	৬.৫	৪.৯
থাইল্যান্ড	৮.৪	১১.০	১০.০	৮.৫
ভারত	৯.০	৫.৭	৫.২	৪.৭
শ্রীলংকা	২.৬	৩.২	৩.০	২.৮
বাংলাদেশ	২.৬	২.১	১.৯	১.৮
নেপাল	৯.৭	২.৫	৩.০	৪.০
পাকিস্তান	৫.৮	৫.১	৪.৭	৫.২

Source : "উন্নয়শীল দেশের শিক্ষা ও উন্নয়ন সমস্যা"-এম, এ কাদের, ১৯৯৩।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, আজকের বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে রাজনৈতিক উপাদানগুলোর মধ্যে যৌক্তিক ক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়ায় অন্যান্য ক্ষেত্রেও যৌক্তিকতা লাভ করেছে। তারই অঙ্গ হিসেবে শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানের বিকাশ ঘটেছে ইতিবাচক ধারায়। এ সকল দেশের স্বাক্ষরতার হার ১০০% ভাগ। এসব দেশে শিক্ষার গুণগত মান অবিরত ধারায় সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এরই ফলশ্রুতিতে এসব দেশে উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল।

উন্নত দেশের সামাজিক পাবিেশগত মাত্রাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এসব দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অযৌক্তিক রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে সামনের দিকে এগুতে পারছে। শিক্ষা

ব্যবস্থার সাথে জড়িত যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের চিন্তা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে শিক্ষাকে প্রতিনিয়ত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা দৃঢ় প্রত্যয়ি।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশগুলোর অধিকাংশই দীর্ঘদিন যাবৎ একটি অযৌক্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ প্রক্রিয়ায় এসব দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় উপাদানের সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত উপাদানও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কবলে পড়ছে। এতে সকল ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা ব্যবস্থাও সামগ্রিকভাবে অব্যবস্থা ও অরাজকতা পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হচ্ছে। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি ও পেশী শক্তির প্রসার লাভ করছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিস্তার লাভ করছে, শিক্ষণ প্রক্রিয়া হচ্ছে ব্যহত। শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ তাদের অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছে না। এ প্রক্রিয়াই সামগ্রিকভাবে এসব দেশে শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মানের বিকাশ ঘটাতে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপসংহার

যে কোন দেশের শিক্ষার বিকাশ সে দেশের সামাজিক কাঠামোর উপাদানগুলোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় উপাদানের মধ্যে বিদ্যমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শিক্ষার গতি ও প্রকৃতির উপর অহরহ প্রভাব ফেলে। এ প্রভাব যদি যৌক্তিক বা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে শিক্ষার বিকাশ ও ফলাফল যৌক্তিক হয় না। বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশে এ অযৌক্তিক ধারা চলে আসছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে দেশের জনগণকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়াতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক উপাদানের যৌক্তিক প্রভাব। এর জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্রে যৌক্তিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক উপাদান হচেছ অন্যান্য উপাদানের পরিচালক। রাজনৈতিক উপাদানই অন্যান্য উপাদানের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে ও শিক্ষার চাহিদা আসবে। আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ থেকে শিক্ষার চাহিদা অনুভূত হচ্ছে না। কারণ ৮৫% জনগণ নিম্নবিত্ত শ্রেণীতে বাস করে। তারা সচেতন নয়। তাই Push factor হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী নেওয়া হলেও এগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে না মূলতঃ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে। শ্রেণী কাঠামোগত মাত্রায় শিক্ষাকে বিচার করতে গেলেও শিক্ষার গুণগত ও

পরিমাণগত মান বাড়াতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটাতে হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার একটা সমাজে যতখানি আছে তার উপর নির্ভর করে সেই সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ। এর সাথে শিক্ষার বিস্তারও হতে হবে। এ দুটো পরস্পর সম্পর্কিত এবং নির্ভরশীল। এজন্য সমাজে বৃহত্তর নীতি (Macro policy) গ্রহণ করতে হবে। বৃহত্তর নীতি এমন হতে হবে যাতে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকে, যেন অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। শিক্ষাকে কোন অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না।

তথ্য নির্দেশিকা

1. Swift, D. F., 1970, ***Basic Reading in The Sociology of Education***-London: Rut ledge And Began Paul.
2. Sukla, S. C., 1963, ***The Content of Education Developing Societies***-New Delhi : Central Institute Of Education.
3. Ashley, Beacon, Et. al, 1969, ***An Introduction to The Sociology of Education***, London : The Macmillan Co.
4. Choudhury Lutful Hoq : 1978, ***Social Change and Development Administration in South Asia,*** *NIPA, Dhaka.*
5. ***The Words Bank Of Encyclopedia;*** Vol-E
6. Tiled, Jandhyala B G., 1987, ***The Economics of Inequality in Education***-*Sage* Publications, New Delhi.
7. Deveauvais, Michael., 1981, ***Education and Development in The New International Economic Order,*** IIEP Occasional Papers, No 55. UNESCO International Institute Fro Educational Planning.
8. Rahman, HZ and Hossain, M., 1992; ***Rethinking Rural Poverty : A Case for Bangladesh*** (Mimeo) BIDS.
9. Ginsberg, M. (1934), ***Sociology,*** Oxford University, London.
10. ***Human Development Report,*** UNDP, 1995, (Published On 17th August 1995).
11. ***Bangladesh Bureau of Educational Informational and Statistics*** (BANBEIS), 1988, Dhaka.
12. Lee Change H, And Yamazawa Pipe, 1990, ***The Economic Development of Japan And Korea-A Parallel With Lessons,*** New York, West Port, Connecticut London.
13. ***First Five Year Plan,*** (1973-78), Planning Commission, Ministry of planning, Government of Bangladesh, Dhaka.
14. ***Second Five Year Plan,*** (1980-85), Planning Commission, Ministry of planning, Government of Bangladesh, Dhaka.
15. ***Third Five Year Plan,*** (1985-90), Planning Commission, Ministry of planning, Government of Bangladesh, Dhaka.
16. ***Fourth Five Year Plan,*** (1990-95), Planning Commission, Ministry of planning, Government of Bangladesh, Dhaka.

১৭. আসাদুজ্জামান এবং নাসরীন জাহান জিনিয়া : ২০০০, *বাংলাদেশ বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সমস্যা: রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার একটি সমীক্ষা,* লোক প্রশাসন সাময়িকী, সপ্তদশ সংখ্যা, বিপিএটিসি সাভার, ঢাকা।

১৮. খালেকুজ্জামান : ২০০১, *শিক্ষা সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ,* সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা।

১৯. রহমান আতিউর : ১৯৯৪, *উন্নয়নে শিক্ষার অবদান : বাংলাদেশের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষনীয়,* বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১১ম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা বি, আই, ডি, এস, ঢাকা।

২০. বাটোমোর, টম : ১৯৯২, *সমাজ বিদ্যা : তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা,* অনুবাদ হিমাচল চক্রবর্তী, কেপি বাগচী অ্যাড কোম্পানী, কলকাতা, ইন্ডিয়া।

২১. লতিফ, আবু হামিদ : ১৯৮৪, *উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২২. হক, মোহাম্মদ নাজমুল : ১৯৯১, *জনসংখ্যা শিক্ষা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৩. কাদের, এম, এ, ১৯৯৩ : *উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ও উন্নয়ন সমস্যা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৪. মালেক, আব্দুল : ১৯৯০, *বাংলাদেশের শিক্ষা সংকট-সামাজিক কারণের স্বরূপ বিশ্লেষণ,* বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বাংলা একাডেমী, কার্তিক-পৌষ ১৩৯৮, ঢাকা।

২৫. *দৈনিক সংবাদ,* ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৫ইং।